ফিঙের বাসা

গৌতম রায়

পুনশ্চ

এতো তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজটা শেষ হয়ে যাবে ভাবে নি দীপল। বোলপুর স্টেশনে নেমেই ফোন করেছিল উপল সেনকে। বিশ্বভারতীর পিয়ারর্সন হাসপাতালে সি সি ইউ হওয়ার কথা চলছে। বিশ্বজিৎ রায়, দীপলের কোম্পানীর সেলসের এরিয়া ম্যানেজার, কাল রাতে ছুটির ঠিক আগেই বললো;

শোন উপল তোর তো আবার একটো কবিতা বাই আছে। যা শান্তিনিকেতনে এখন থেকেই ইট পেতে রাখ উপল সেনের কাছে।

সেই ইট পাতার প্রাইমারি কাজটা করতেই শান্তিনিকেতনে আসা। আসলে এখানের আসার আসল উদ্দেশ্যটা সেঁজুতির সঙ্গে এই সুযোগে একটু নিরিবিলিতে সময় কাটানো, মানে রথ দেখা আর কলা বেচাটা একসাথে করে ফেলা আর কী। এরিয়া ম্যানেজারের কথায় তাই একবারেই রাজি হয়ে গিয়েছিল দীপল।

ওদের জেডসন ফার্মাসিউটিকালে সেলস ডিপার্টমেন্টে এরিয়া ম্যানেজার বনাম এক্সিকিউটিভদের ভিতরে কথার মার প্যাচ কে ঘিরে সব সময়েই একটা ঠান্ডা লড়াই চলে। অনেকটা বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনীর মতো ব্যাপার আর কি। সোজা ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়,কথা বেচে ভাত জোটাতে হয় সেলসের লোকেদের। দীপল ঝা চকচকে সুট টাই পড়লেও নিজেকে লোকাল ট্রেনের বিষহরি তেল বেচা ব্যানার্জিদা বা স্বপন বাউলের আমলকি বেচা রামশরণের থেকে নিজেকে খুব একটা আলাদা ভাবতে পারে না। যদিও এই শ্মশান বৈরাগ্য তার আসে কোম্পানীর সি এম ই তে খানাপিনার আগে দু এক পাত্তর পরলে পরে।

হাসপাতালের গেটের কাছে এসে দীপল দেখলো ডেনিম জিন্স আর ফ্যাবিন্ডিয়ার পাঞ্জাবী পরা একটা ছেলে বাইকে করে ঢুকছে।

দাদা, ঘোষদার দোকান টা কোন দিকে?—দীপলের প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল লোকটা।

ঘোষদার দোকান? কিসের দোকান?—লোকটার কথার জবাবে দীপল বললো; চা, স্নাক্সের আর কি।

চা খাবেন? পাতি চা খেতে হলে রাস্তায় অনেক দোকান আছে। ঘ্যামা চা যদি খেতে চান আলচাণতে চলে যান। রতন পল্লীতে।

দীপল ভাবছে সেঁজুতি তো বলেছিল ঘোষদার দোকান শান্তিনিকেতনে খুব ফেমাস। বিখ্যাত কালোর দোকানের মতো পেডিগ্রি না থাকলেও ঘোষদার দোকান ও কৌলিন্যে কম যায় না। এই মালটা তাহলে কি ভাট বকছে?

আপনি ঘোষদার দোকান যাবেন তো? এই বাঁ দিক দিয়ে একটু এগিয়ে যান।

দেখবেন সামনে যে বাড়িটা ডান হাতে পড়ছে, সেটার নাম ইতিণ। ওটার গা দিয়েই একটা কাচা রাস্তা। ওই কাঁচা রাস্তাটাতে ঢুকেই বা হাতে দেখবেন দোকানটা।—ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকা এক প্রৌঢ় যেচে বললো দীপল কে।

কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালো দীপল। ডান দিকের বাড়িটা বেশ অনেকটা জমি নিয়ে। গেটের বাঁদিকে দেখতে পেল একটা পাথরের ট্যাবলেট। একদম ফেড হয়ে গেছে। কোনো ভাবে পড়া গেল 'ইতি'। লোহার হাফ গেটটার ডান দিকে আর ও একটা ফেড হয়ে যাওয়া ফলকে লেখা 'লীলা রায়'। সময় যেন এখানটায় একটু থমকে রয়েছে। দীপল ভাবলো; সাহিত্যিক পরিমন্ডলে আমি শালা মালটা কি খুব মানান সই? পরমুহূর্তেই তার মনে হলো অসীমদার বইয়ের দোকানে এই কদিন আগের একটা ঘটনা। এমনিই সেদিন দীপল অসীমদার দোকানে গেছিল। কিছু কেনাটেনার ছিল না। অসীমদা গেলেই চা খাওয়ায়। ফোকোটে চায়ের লোভেই অসীমদার বইয়ের দোকান 'সরস্বতী বুক স্টলে' হানা দিয়েছিল দীপল।

একটি মেয়ে অ্যাপলায়েড ফিজিক্সের বই কিনতে এসেছে বাবার সঙ্গে। স্কুল লেবেলের বই। ওই সময়ে অসীমদার দোকানে একজন রিটায়ার্ড হেড মাষ্টারমশাই ও ছিলেন। মেয়েটির বাবা এমন অবলীলায় ফিজিক্সের বইটাকে 'মাল' বলে আওয়াজ দিলেন যে দোকানের মালিক অসীমদা একটু চমকেই উঠে বললেন; আরে শেষপর্যন্ত 'বই' কেও মাল করে ফেললে? এখানে এমন অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা তোমার এই বই কে 'মাল' করে ফেলাতে রীতিমতো শকড! লোকটার মধ্যে অবশ্য কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। আসলে সেলসের ভাষা এখন চলতি বাংলা ভাষাতে ঢুকে পড়ে সব ওলট পালট করে দিয়েছে। ভাবতে ভাবতেই ডান দিকে চোখ পড়লো দীপলের। একটা ঝোপের ভিতর থেকে যেন ডাক দিল সেঁজুতি;

এদিকে আয় রে দীপল।

একটা বেঞ্চির উপর বসে আছে সেঁজুতি। তাকিয়ে বুঝলো দীপল, যেটাকে ঝোপ মনে করেছিল, সেটা ঠিক ঝোপ নয়। ছোট ছোট কেয়ারী করা বেশ কতকগুলো ঝাউগাছ। সামনে ছোট্ট টেবিল। আশে পাশে একটা ওই রকম আধটা টেবিল আর বেঞ্চি ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে। একটা খড়ের ছাউনির নিচে দুটো গণগণে উনুন জ্বলছে। মাঝ বয়সী একজন বড় একটা কড়াইতে কিছু ভাজছে। পাশে একজন মাঝ বয়সী মহিলা তাকে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে-সেঁজুতির সামনের বেঞ্চিটায় বসবার সময়ে দেখলো দীপল।

কি খাবি বল?

সেঁজুতির কথার উত্তরে ঠোঁট টা একটু ছুচলো করে ইঙ্গিত করলো দীপল।

অসভ্যতা করিস না। বল, চায়ের সঙ্গে কি খাবি? স্টেশনে ভাত খেয়েছিস?

দাঁড়া তো, গুছিয়ে বসতে দে। একদম উকিলের মতো জেরা করছিস তো—হাসতে হাসতে বললো দীপল।

কচুরি চলবে তো? কচুরির সঙ্গে ঘুগনিটা কিন্তু এখানে একঘর করে—

চেঁচিয়ে উঠলো সেঁজুতি-হারুদা, আমাদের দু প্লেট কচুরি আর চা।

বসো একটুকুনি। গরম গরম ভেজে দিচ্ছি-উত্তর দিলো হারুদা।

সাথে মিষ্টি কিছু দেবোনিকো?—হারুদার পাশ থেকে ওর বউ বলে উঠলো।

না বউদি, এখন আর মিষ্টি খাবো না-বলে দীপলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে সেঁজুতি বললো; কবে কার মিষ্টি তার কোনো ঠিক ঠিকানা আছে?

তা হলে কতো ভালো ভালো দোকান থাকতে এই রকম একটা রদ্দি মারকা দোকানে ঢুকলি কেন?—দীপলের গলায় একটু বিরক্তি।

আসলে এই বিরক্তিটা বেশ কিছুদিন ধরে দীপলের জীবনের সঙ্গে কেমন যেন পাটি সাপটার মতো সেঁটে গেছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কটা কি দীপলের কেবল বিরক্তিরই? ও মাঝে মাঝে ভাবে। তবে ভেবে কিছু কুল কিনারা পায় না। বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিতরে সব সময়ে বিরক্তি আসাটা তো এক ধরণের অসুখের লক্ষণ। আর এই অসুস্থতাটা শারীরিক নয়, মানসিক। তাহলে কি দীপল মানসিক ভাবে অসুস্থ? এই ভাবনাটা বেশ কিছুদিন ধরে দীপল কে বেশ চিন্তার ভিতরে ফেলে দিয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার তল রয়েছে। কিন্তু মানসিক অসুস্থতাটা দীপলের কাছে অতল, অতলান্তিক বলে মনে হয়। ও কোনো কূল কিনারা পায় না।

আসলে এই মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারটা নৈহাটির ঐশনদার মাইমার ঘটনার ভিতর দিয়ে দেখেছিল দীপল। ঠিক দেখেছিল বললে ভুল বলা হবে। শুনেছিল। আসলে ঐশনদা এতোটা আন্তরিকভাবে সেই যন্ত্রণা গুলোর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের খন্ডগুলোকে হাজির করেছিল-সেই কষ্ট গুলোকে শোনার থেকে দীপলের কাছে তাই বেশি দেখা বলেই মনে হয়েছিল। দীপল আসলে এই সেলসের লাইনটা বেছে নিল কেন, কি রকম করে-সেটা ভাবতে গেলেও ওর একটা বিরক্তিই আসে। এই বিরক্তির কথাগুলোই একদিন হঠাৎ ঐশনদার কাছে বলে ফেলেছিল সে। সেলসের চাকরিতে হৃদয়ের স্পন্দন বলে কিছু থাকার কথা নয়। 'হৃদয়দ নামক শধটাই সেলসের ছেলেদের থাকতে নেই।' তবু ও সেই ডায়ালেসিস মেশিন বেচতে গিয়েই ঐশনদার নার্সিংহোমের অফিস রুমে গিয়ে প্রথম দিন একটু চমকেই গিয়েছিল দীপল। লোককে মিষ্টি কথা বলে মেশিন বেচাই তার কাজ। ছোট, বড়, মাঝারি—নানা মাপের নার্সিংহোমেই তার যাতায়াত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নার্সিংহোমের অফিস ঘরে কাউকে আপন মনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যেতে দেখে নি দীপল। আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গে একটু বিরক্তি ও যে তার তখন হয় নি, তা নয়।

ভেবেছিল, এ কোন পাগলের আড্ডাখানায় এসে পড়লাম রে বাবা। নার্সিংহোমের অফিস। কোথায় কোন ডাক্তার কেমন রুগী পাঠাচ্ছে, কেমন কমিশন খাচ্ছে-এসব ব্যাপার নিয়ে কথা হবে। তা নয়, তার বদলে অফিস ঘরে বসে একজন চোখ বন্ধ করে গেয়ে চলেছে; 'ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ, আমি মর্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব—শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।'

বিরক্তির সঙ্গে এই একটু অন্য রকম স্বাদটা খুব একটা বদখত লাগে নি দীপলের। ও অফিস ঘরে ঢুকতেই ওকে না জেনে, না চিনেই একজন লম্বা ছিপছিপে মতো লোক হাতের ইশারাতে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করলো। বেশ খানিকটা সময় গান চললো। গানটা শেষ হতেই দীপলের দিকে তাকিয়ে সেই লোকটা একটু হেসে বললো:

পিঙ্কু, এক মিনিট টা দাঁড়া। ইনি এসেছেন। কি ব্যাপার একটু শুনি।

শিল্পী সেই পিঙ্কু যেন একটু বিরক্ত ই হলো তার গানের গতিতে চ্ছেদ পড়ার জন্যে। মনে মনে হাসি ই পেল দীপলের। তাহলে বিরক্তিটা কেবল তার একারই লাগে না।

আপনি?—সেই ভদ্রলোক এবার পরিপূর্ণ অ্যাটেনশন দিলেন দীপলের দিকে।

আমি ঐশন বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। শুনলাম উনি ডায়ালেসিস মেশিন ইনট্রল করার কথা ভাবছেন, তাই। আমি দীপল।

আমি ই ঐশন। আপনার কি খুব তাড়া আছে?—ঐশন জানতে চাইল।

না তেমন একটা নয়-একটু বিরক্তি মাখিয়েই দীপল বললো। কারণ, তাড়া না থাকলেও নৈহাটি থেকে কলকাতায় পৌঁছাতে খুব একটা কম সময় লাগবে না। এই হিসেবটা তার মাথার ভিতরে ছিল। তাই দীপলের ক্রনিক ডিজিজের মতোই বিরক্তিটা একটু একটু মাথাচাগাড় যে দিচ্ছিল না-তা বলা যায় না। তবে কি না মেশিন বেচার তাগিদ। মেশিন অবশ্য ওর কাছে লদী। সেই অসীমদার দোকানে বই কিনতে আসা লোকটার মতো 'বই' কে 'মাল' বলার মতো ভুলেও দীপল কখনো মেশিন পত্রকে মাল বলে না। আসলে এই ভোকাবুলারির ব্যাপারটা ছোট থেকেই কেমন যেন ঠিক ঠাক ই ওর মাথাতে থেকেছে। যাকে যা বলবার, তার বাইরে খুব একটা অন্য কোনো শধবন্ধনী দিয়ে সেই জিনিষটাকে বোঝাবার মতো পরিস্থিতি ওর কখনোই তেমন একটা হয় নি।

হয় নি কী? মনে মনে একটা পুরনো ঘটনার জের টেনে বেশ একটু মজাই পায় এখন দীপল। ও তখন বেশ ছোট। ওর দাদুর ব্ল্যাড টেস্টের জন্যে কোনো একটা ল্যাব থেকে কেউ এসে স্যাম্পেল কালেকশন করে নিয়ে গেছে। দীপলের উপর দায়িত্ব পড়েছে সন্ধ্যে বেলাতে সেই ল্যাবে গিয়ে রিপোর্টটা কালেক্ট করে আনবার। তখন সদ্য সদ্য বড়ো রাস্তাতে সাইকেল চালাবার লাইসেন্স জুটেছে ওর।

দীপলের ছোটমাসী বলেছে ; সকালে ডাম্বেল বাবু এসেছিল বাবার রক্ত নিতে। নিয়ে গেছে। তুই বিকেলে গিয়ে ওদের ওখান থেকে একটু রিপোর্টটা নিয়ে আসিস।

ভালো কথা। সেই মতোই বেশ সুবোধ বালকের মতোই বিকেলে সেই ল্যাবে গিয়ে দীপল বলেছে; সকালে ডাম্বেলবাবু গিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে দাদুর ব্লাডের স্যাম্পেল নিয়ে এসেছিল। আমি এসেছি তার রিপোর্ট টা নিতে।

ছোট্ট ল্যাব। সেরকম রিসেপসনিস্টের কেতা নেই। যাকে এইসব কথা গুলো দীপল বলেছে, সেই ভদ্রলোক ই ওখানকার ডাক্তার কাম প্যাথোলজিস্ট। পরে দীপল শুনেছিল, ভদ্রলোক নাকি আদতে ভেটেনারি সার্জেন।